# তৈরী পোষাক শিল্পে সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আলী ইমাম মজুমদার (১৮ মে, ২০১৩)

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি ভবন ধ্বসে প্রাণহানী ঘটেছে এগার শতাধিক লোকের। আহতও প্রায় আড়াই হাজার। তাদের একটি অংশ জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাবে। এ লোকগুলোর প্রায় সকলেই তৈরী পোষাক শিল্পের কর্মী এবং মূলত নারী। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ণ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি হুমকির মুখে আছে আমাদের তৈরী পোষাক শিল্প খাত। অথচ চীন ও ভারতে শ্রম মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শ্রম ঘন এ শিল্পটি থেকে তারা ক্রমান্বয়ে সরে পড়ছে। ক্রেতাদের একটি বড় অংশ ঝুঁকতে শুরু করেছিল বাংলাদেশের দিকে।

শিল্পটির সূচনা আশির দশকে দেশ গার্মেন্টস নাম একটি কারখানার মাধ্যমে। প্রথমে হাটি হাটি পা পা করে চলছিল। তবে ছিল উদ্যোক্তা শ্রেণীর অবিরাম প্রচেষ্টা। আরও ছিল সরকারের অব্যাহত প্রণোদনা। সর্বোপরি এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিবেদিত কঠোর শ্রম ছিল এর মূল চালিকা শক্তি। তদুপরি দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির সূচনা হলে ক্রেতারা বাংলাদেশের দিকে ঝুঁকতে থাকে। ত্বরান্বিত হয় এর বিকাশ। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মাঝে আমাদের এ শিল্পটি অগ্রসর হচ্ছে। যোগাযোগ অবকাঠামোর অপ্রতুলতা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট সত্বেও এর প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটে চলছে।

উল্লেখ করা যায় তৈরী পোষাক আমাদের প্রধান রপ্তানী পণ্য। ২০১১-১২ সনে দেশের সর্বমোট চব্বিশ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানীর মাঝে এ খাতে একক অবদানই বিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদিও এ বিশ বিলিয়ন পুরোটাই নীট বৈদেশিক মুদ্রার আয় নয়। এটা আয় করতে কারখানার যন্ত্রপাতি, কাপড়, সুতাসহ বহু কিছু আমদানীতে একটি বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়। তবু বলতে হবে এ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বস্ত্র কারখানা সহ বোতাম, চেইন, প্লাষ্টিক ইত্যাদি শিল্প। নির্মাণ শিল্প, পরিবহন, ব্যাংক-বীমা, জাহাজ সহ সকল খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধিতে তৈরী পোষাক শিল্প খাতের বিশাল অবদান রাখছে। এর প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকে। তবে মোটামুটি বলা যায় নীট ও ওভেন মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার কারখানা চালু রয়েছে। আর এগুলোতে সরাসরি কর্মরত আছে প্রায় বত্রিশ লক্ষ শ্রমিক। এদের সিংহ ভাগই নারী। শুধু কর্মসংস্থান নয় এটা নারীর ক্ষমতায়নেও বড় ধরণের ভূমিকা রাখছে। ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে আমাদের আর্থসামাজিক খাতে। উদ্যোক্তা শ্রেণীর যতই সমালোচনা আমরা করি মূলত তাদের প্রচেষ্টাতেই এ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটে চলছে। তবে মানবিক দিকটি এ শিল্পে উপেক্ষিত হচ্ছে এ অভিযোগ ব্যাপকভাবে রয়েছে। কারখানার শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বেশকিছু শিল্প কারখানায় গৌণ বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হয়। ফলে দূর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটে প্রায়শ। বেতনাদি শোচনীয় ভাবে কম এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনিয়মিত। আইএলও কনভেনশন শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার দিয়েছে বাংলাদেশ সে কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। কিন্তু গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের সে কার্যকর হতে দেয়া হচ্ছেনা। এ সকল ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে কিছু বিপথগামী ব্যক্তির প্ররোচনায় শ্রমিকদের একটি অংশ কখনও কখনও হামলা, ভাংচুরসহ নাশকতামূলক কাজ করে থাকে। এর ফলে গার্মেন্টস কারখানা ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ হয় রাজপথে চলাচলরত গাড়ী ও তার যাত্রীরা এবং অন্যান্য স্থাপনা। ক্ষেত্র বিশেষে অবরোধের শিকার হয়ে আটকে থাকতে হয় হাজার হাজার যাত্রীকে। এ সমস্যা সমাধানে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ সাংগঠনিকভাবে কিছু উদ্যোগ নিলেও চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। আর এ দুটো সংগঠনও ভোটের রাজনীতির কবলে পড়ে প্রায় ক্ষেত্রেই অন্যায়কারী মালিকদের পক্ষাবলম্বন করে। তবে এ স্বর্ণ প্রসবিনী হাসটিকে যেন বধ না করা হয় সেজন্যে শ্রমিকসহ সকলের সতর্ক সহযোগিতা দরকার।

পৃথিবীর কোন দেশেই শিল্প কারখানায় দূর্ঘটনা ও প্রাণ বা অঙ্গহানী একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তবে দেখার থাকে কারখানাটি দূর্ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা। পোষাক শিল্প মালিকদের মাঝে মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন সজ্জন ব্যক্তিও অনেকেই আছেন। তার জন্যে তারা দূর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেন তাদের প্রতিষ্ঠানে। তবে বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে এমন বেশ কিছু ক্ষেত্রও রয়েছে। আশুলিয়ার তাজরিন ফ্যাশনস্ এ অগ্নিকান্ডে প্রাণ হারান একশত এগার জন শ্রমিক। এর আগে পত্র-পত্রিকার হিসাব মতে তৈরী পোষাক শিল্পে ১৯৯০ সাল থেকে

আগুন পুড়ে মৃত্যুর সংখ্যা তিন শতাধিক। আগুনের ঘটনা ছাড়াও ২০০৫ সনের এপ্রিলে সাভারের স্পেকট্রাম গার্মেন্টেসর পুরো ভবনটি ধ্বসে নিহত হয় বাষট্টি জন শ্রমিক। আর এবারে সাভারের রানা প্লাজার ঘটনাটি তো সবগুলোর যোগফলের প্রায় তিন গুন। পশ্চিমের ক্রেতা দেশগুলোর কাছে ধিকৃত হচ্ছি আমরা। এসব শ্রমিকদের সেখানকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ শ্রমদাস হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। সোচ্চার ঐসব দেশের শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো। এদের চাপকে অব্যাহত ভাবে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করতে পারবে না তাদের সরকার। বিদেশী ক্রেতারাও আজ বিপাকে। আমাদের অপকর্মের দায়ভার তাদেরও নিতে হচ্ছে স্বদেশে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশ থেকে তৈরী পোষাক ক্রয়ে তাদের মাঝে কিছুটা অনীহা দেখা দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধা বহাল থাকছে অন্য দিকে ছাড় দিয়ে টিকফা চুক্তি করে। আর ইউরোপিয় ইউনিয়নও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলছে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ২০১১-১২ সালে তৈরী পোষাক রপ্তানীর যথাক্রমে চব্বিশ ও উনষাট শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় ইউনিয়নে। সেখানে বিঘ্ন ঘটলে আর থাকবে কি? তবে আশার কথা তাদেরই কেউ কেউ সেসব দেশের বড় বড় আমদানী কারকদের চাপ দিচ্ছে আমাদের পোষাক শিল্পের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করতে।

তৈরী পোষাক শিল্প কারখানা চালু করতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক হয়। যেমন ভবন নির্মানে কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কিংবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়। অনুমোদিত নকশা অনুসরণ ও যথাযথ নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তাও তাদের তদারক করার কথা। এরপর আসছে অগ্নিনির্বাপন বা বিকল্প পথে বাহির হওয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে সম্মতি দেয়ার বিধান ফায়ার সার্ভিস বিভাগের। তদ্রুপ বিধান এগুলো কিছু দেখে এবং নিজেরা তদারক করে দোকানপাট ও কলকারখানার পরিদপ্তর শিল্পটি চালুর অনুমতি দেবে। কিন্তু দুর্ভাগা এ দেশটিতে স্বাভাবিক নিয়ম খুব কম ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই তড়িৎ গতিতে এসব অনুমোদন মিলে যায়। আর দুর্ঘটনার পর মালিক, ব্যবস্থাপক সহ এসব কর্তৃপক্ষের দায়ী ব্যক্তিদের অবহেলা আছে কিনা এটা অনুসন্ধান করে দেখা হলেও কোন ঘটনায় কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমনটা জানা যায় না। দেখা যায় তাজরিন ফ্যাশনস্ কারখানাটি ছিল একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। এর তিন দিকে জনবসতি। সামনে দশ ফুট রাস্তা। এখানে ফায়ার বিগ্রেডের বড় গাড়ী ঢোকাও সম্ভব নয়। এখানে বহুতল ভবন নির্মাণ ও গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের অনুমতি কে বা কারা দিল তা কিন্তু জনগণের সামনে আজতক তুলে ধরা হয়নি। সম্ভবত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি তাদের বিরুদ্ধে। মালিকের বিরুদ্ধে তো নয়ই।

দায়িত্বশীল শ্রমিক ইউনিয়ন যেকোন প্রতিষ্ঠানের জন্যে কল্যাণকর। কিন্তুকোন না কোন ভাবে তৈরী পোষাক শিল্প কারখানায় ইউনিয়ন করতে দেয়া হচ্ছেনা। পক্ষান্তরে চা শিল্পে দীর্ঘদিন শ্রমিক ইউনিয়ন কাজ করছে। এদের দ্বারা বিরল দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতিত বড় কোন সংকট হয়েছে এমনটা তো জানা যায়না। ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়াত্ব কিছু কারখানায় এসব ইউনিয়ন বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ আছে। অভিযোগের অংশবিশেষ যথার্থ। তবে এটা অনেকেই জানেন নিজদের প্রয়োজনে তাদের টেনে আনে মেরুদন্ডহীন দুর্নীতি পরায়ন ব্যবস্থাপনা। আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, সাম্প্রতিক কালে হলমার্কের মত বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নের কোন নেতা জড়িত ছিলেন এমন অভিযোগ কেউ করেনা। কোন কার্যকর শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকার ফলে তৈরী পোষাক শিল্পখাতে যে কোন অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পুলিশের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয়। আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতিতে পুলিশ আসবে এটাই স্বাভাবিক। তবে দ্বিপক্ষিয় (মালিক ও শ্রমিক) কিংবা ত্রিপক্ষিয় (মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধি) বৈঠকের মাধ্যমে এ ধরণের সমস্যা সমাধান করা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ সংস্থাটির সদস্য এবং এতদবিষয়ক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী। শ্রম আইনেও এভাবে সমাধান খোঁজার বিধান রয়েছে। শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে কথায় কথায় পুলিশ ডাকা যথার্থ নয়।

পোষাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছে আজ থেকে তিন বছর আগে। নগর কেন্দ্রিক অন্য যেকোন খাত থেকে তা অনেকটা কম। মাসে মাত্র তিন হাজার টাকা। এ ধরণের কম বেতনভোগী চা শ্রমিকেরা চা বাগান এলাকায় বিনা মূল্যে বাসস্থান পান। ইদানিং বাগান মালিকগণ তাদের জন্যে পাকা ব্যারাক তৈরী করা শুরু করেছেন।

সেখানেও রয়েছে চিকিৎসা সুবিধাও। বাগান মালিক সরকার থেকে কিনে ভর্তুকি দিয়ে নাম মাত্র মূল্যে (এক টাকা ত্রিশ পয়সা কেজি) কিছু চাল কিংবা আটা রেশন হিসেবে দেয়। এগুলোর কোন কিছুই কি আছে আমাদের তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমিকের জন্যে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন সজ্জন মালিক বিনা মূল্যে দুপুরের খাবার দেন। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। আর প্রকৃত লাভবান হন মালিক। পত্রিকার খবরে প্রকাশ যুক্তরাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলো দাবী করছে যে পোষাক প্রতি মাত্র তিন সেন্ট মূল্য বৃদ্ধি করলে এ খাতে শ্রম মজুরী দ্বিগুন করা যায়। আমাদের তৈরী পোষাক শিল্প মালিকগণ পাশ্চাত্যের এ আবেগ ও সহমর্মিতাকে কাজে লাগাতে পারেন।

এমনিতে সংঘাতের রাজনীতি, প্রাত্যহিক হরতাল, অবরোধ ও হানাহানি আমাদের অর্থনীতির জন্যে একটি অশনি সংকেত। অনেক সময়ই পণ্য চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক না থাকায় সময় মত বন্দরে মাল পৌঁছানো ও জাহাজীকরণ এখন শোচনীয় রকমের অনিশ্চয়তার মাঝে রয়েছে। ফলে ক্রেতাগণ নুতন ক্রয়াদেশ দিতে শংকিত বলে জানা যায়। উৎপাদিত মালামাল সময়মত পৌঁছানোর জন্যে কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করে জাহাজের পরিবর্তে বিমান ব্যবহার করা হয়। এতে মালিকগণ প্রচন্ড আর্থিক চাপের মাঝে আছেন। তা সত্ত্বেও কারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত হতে পারেনা। অতি সম্প্রতি জানা গেছে সরকারের তৈরী একটি টাস্ক ফোর্স কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। তবে এসব বিষয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

এক কথায় বলা চলে আমাদের তৈরী পোষাক শিল্প খাতটি আজ একদিকে অপার সম্ভাবনা এবং অন্যদিকে বহুমাত্রিক সংকটের মুখোমুখি। সমস্যা ও সম্ভাবনা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এসব সমস্যা ঘনীভূত হয়ে সম্ভাবনাটিকে নস্যাৎ করুক এটা কেউ চায়না। তাই সমস্যাগুলোর গভীরে গিয়ে এগুলোর দ্রুত সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। সমস্যাগুলো ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে এরপর কিছু আলোকপাত করছি।

১। **কারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তা**- মানুষের জীবন অমূল্য সম্পদ। তেমন অমূল্য তার যেকোন একটি অংগ। কারও লোভ কিংবা অবজ্ঞার শিকার হয়ে তৈরী পোষাক কারখানায় প্রাণ বা অংগহানী ঘটতে থাকুক এটা কেউ চাইতে পারেনা। সেজন্যেঃ-

ক) সরকারী উদ্যোগে (যা এখন টাস্ক ফোর্স নামে চলছে) জরুরী ভিত্তিতে সকল নির্মাণজনিত ঝুঁকিপূর্ণ পোষাক কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। এ কাজে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এমনকি ক্রেতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিও কিছু এনজিও'র সহায়তা নেয়ার আবশ্যকতা থাকতে পারে।

খ) জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি কারখানা চলাকালে সর্বদা খোলা রাখতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ও ভবনের ফ্লোরের হিসেবে একাধিক বহির্গমন পথ আবশ্যক হতে পারে। এসব বহির্গমন পথে মালামাল রেখে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবেনা। মালপত্র চুরি যাবার ভয়ে এগুলো বন্ধ রাখা অমানবিক ও অপ্রয়োজনীয়। সিসিটিভি এর মাধ্যমে নিরাপত্তা কর্মীরা সহজেই এ ধরণের চুরি ঠেকাতে পারে। যথাযথ বহির্গমন সিঁড়ি না থাকলে সেগুলোকেউ ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে তা তৈরী করার সুযোগ দেয়া যায়। উপরে বর্ণিত টাস্কফোর্সই এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবশ্যকতা রয়েছে।

গ) গার্মেন্টস শিল্পের গুনগত মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি তদারকের সুবিধার্থে দীর্ঘ মেয়াদে এগুলোকে মহানগরীর অলিগলি ও এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কারখানাগুলোকে এক বা একাধিক বৃহৎ গার্মেন্টস পল্লীতে স্থানান্তরিত করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যায়।

**২। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সুবিধাদিঃ**

ক) পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রতিটি কারখানায় নিশ্চিত করতে হবে। এর পরিবেশ থাকতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত। ক্রেতা সংস্থাগুলো কে এ ব্যাপারে আবশ্যকীয় সহায়তা দেয়ার জন্যে কারখানা মালিকগণও অনুরোধ করতে পারেন। কেননা এসব কারখানায় তাদের ব্র্যান্ড নামেই পোষাক উৎপাদিত হয়।

খ) ওভার টাইম ভাতা না দিয়ে কিংবা কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময় খাটানো যাবেনা।

গ) যথাসময়ে মজুরী পরিশোধ করতে হবে। সময়ের সাথে সংগতি রেখে ন্যুনতম মজুরী কিছুটা বৃদ্ধি উদ্যোগ নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। চা শিল্পের ন্যয় এ খাতেও শ্রমিকদের জন্যে রেশনের ব্যবস্থা করার দরকার। এ ভর্তুকির মূল্যটা সরকার নয় মালিকই বহন করা সমীচীন।

ঘ) দূর্ঘটনা জনিত কারণে প্রাণহানি ও অংগহানী হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত অংকের বীমা করতে হবে। প্রাণহানীর জন্যে এর পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার কম হওয়া সমীচীন হবে না। বীমার প্রিমিয়াম মালিক পরিশোধ করবেন। শ্রমিক একটি প্রতীকি অংক দিতে পারে। চা শিল্পের ন্যায় এ খাতেও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ) দূর্ঘটনা কবলিত কিংবা অন্য কোন মানবিক কারণে তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্যে একটি কল্যাণ তহবিল ঘটনের লক্ষ্যে প্রফেসর মোঃইউনুসের সাম্প্রতিক প্রস্তাবটি এ শিল্পের মালিকগণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে পারেন।

**৩। কারখানা স্থাপনের অনুমোদন ও তদারকিঃ**

ক) যে সকল কর্তৃপক্ষ ইমারত নির্মাণ, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও কারখানা চালুর অনুমতি দেয় তাদের সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ অবজ্ঞা করে থাকলে দূর্ঘটনার জন্যে তাদেরও চিহ্নিত করে বিভাগীয় ও ফৌজদারী উভয়বিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) এসব অনুমোদন দিয়েই কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব শেষ করতে পারেনা। নির্ধারিত মানে কারখানাটি নির্মাণ এবং পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সময়ে সময়ে তদারক করা তাদেরই দায়িত্ব। এখানে প্রধান ভূমিকায় থাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন দোকানপাট ও কলকারখানা পরিদপ্তর। ১৯৬২ সালের অনুমোদিত জনবল দিয়ে সংস্থাটি চলছে। আবার সেখানেও অনুমোদিত পদের অর্ধেক শূণ্য। সারা দেশের দোকানপাট ও কলকারখানার তদারকির দায়িত্ব রয়েছে মাত্র অর্ধশত পরিদর্শক। শূণ্য পদগুলো অবিলম্বে পূরণ ও যৌক্তিক পর্যায়ে সময়ের নিরিখে এর জনবলের সম্প্রসারণ একটি জরুরী বিষয়। আবার তাদের কার্যক্রমও যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**৪। শ্রমিক ইউনিয়ন চালু ও কার্যকর করাঃ**

মালিকগণ উদ্যোগ নিয়েই প্রতিটি কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন চালুর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। কারখানা পর্যায়ে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব থাকলে কথায় কথায় পুলিশ ডাকতে হবেনা। দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক ভিত্তিতে অনেক বিতর্কিত বিষয় মিমাংসিত হয়ে যাবে। এ বিষয়টিও সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত শ্রম পরিদপ্তরের। এখানেও জনবল সংকট শোচনীয় রকমের। তারা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন দেয় ও এর কার্যক্রম তদারক করে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে দেয়া এ পরিদপ্তরের আওতায় আসেনা। এখানে উল্লেখ্য আইএলও এর সাথে সরকারের যোগাযোগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে। সুতরাং আইএলও সনদ ও শ্রম আইন প্রতিপালন সহ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়টির। তৈরী পোষাক শিল্প খাতের সাম্প্রতিক সমস্যাদির আলোকে তাদের অগ্রণী ভূমিকা আবশ্যক।

উপসংহারঃ আজকের আলোচ্য বিষয়টির উপসংহার টানবো প্রফেসর মোঃ ইউনুসের সাম্প্রতিক প্রকাশিত এবং পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃতি দিয়ে। তিনি বলেছেন, 'এই শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে দেয়া যাবেনা। বরং শক্তিশালী করার জন্যে সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ হতে হবে। সরকার, পোশাক শিল্পের মালিক, এনজিও, নাগরিক সমাজ সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশী ক্রেতাদের পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তারা যাতে আর কখনও আমাদের কারণে বিপাকে না পড়ে, সে ব্যাপারে সব পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আমরা একতাবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে আমাদের অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে পালন করব।'